দ্যূতক্রীড়ক : জীবনের বাজিগর

সৌমি দাশ

আজকাল পূজাবার্ষিকী ২০২২-এ উপন্যাস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দ্যূতক্রীড়ক। নাটককার ব্রাত্য বসুর কলমে নাট্যসম্রাট শিশির ভাদুড়িকে নিয়ে লেখা উপন্যাসটির উপস্থাপনারীতি সম্পূর্ণ নতুন। একজন এ সময়ের নাট্যকারের কলমে অতীতের ঐতিহ্যযাপন শ্রদ্ধাঞ্জলি সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে। ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ চরিত উপন্যাস হিসাবে উপন্যাসটি বেশ চমকপ্রদ। Martin Gilbert এর 'Churchill : A Life', Elizabeth Gaskell-এর 'The Life of Charlotte Bronte', Humphrey Carpenter এর 'J. R. R. Tolkein : The Authorized Biography', Valerie Boyd-এর লেখা 'Wrapped in Rainbows : The life of Zora Neale Hurston', কিংবা Hermione Lee-এর লেখা 'Virginia woolf' এইসব ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত Historical Biographical Novel-এর পাশে ব্রাত্য বসুর 'দ্যূতক্রীড়ক' একই আন্তর্জাতিকতা দাবি করে। নোবেল ও পুলিৎজারজয়ী বিখ্যাত আমেরিকান সাহিত্যিক Ernest Hemingway-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'The Old Man and the Sea' মনে পড়ে যায় যখন দেখি বৃদ্ধ সান্তিয়াগোর মতোই জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে হারিয়ে একইভাবে ব্রাত্য বসুর নায়ক বাঙালি নটসম্রাট শিশিরকুমার ভাদুড়িও হয়ে ওঠেন অপ্রতিরোধ্য ভাবে আন্তর্জাতিক। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সান্তিয়াগোর মতোই তিনিও যেন একইভাবে বলেছেন — 'But man is not made for defeat...a man can be destroyed but not defeated.' ('The Old Man and the Sea', page 93)

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের নটসম্রাট শিশিরকুমার ভাদুড়ি শুধু একটা নাম নয়, তাঁর জীবন, তাঁর অবদান বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে একটা আলোকিত পথের সন্ধান দিয়েছিল। বাঙালি বিস্মৃতপ্রায় জাতি; শিশিরকুমারের কাল-দেশ-সমাজ, ব্যক্তিজীবন, সিনেমার প্রথম নির্বাক পথ চলা সবটাই কালের গহ্বরে হারিয়ে ফেলেছি আমরা, ব্রাত্যর কলম টাইমমেশিনের সেই সফর পুরো করেছে। উপন্যাস বললে অনেক সময় ভুল হয়, এ তো ইতিহাস! এই কালজয়ী পুরুষকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'নিঃসঙ্গ সম্রাট'। ব্রাত্যর লেখায় তিনি জীবনের বাজিগর। তিনি জীবনের নানা উত্থান পতনের মধ্যেই নিজের ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, নিজের মনের সম্রাট তিনি, জীবনের পাশাখেলায় সবকিছু হারিয়ে খুইয়ে নটসম্রাটের সম্রাট হয়েই এগিয়ে চলার দৃঢ়তা, ঋজুতা, অদম্য জেদ ও নাটকের প্রতি প্যাশন। নাটক তাঁর অবিচ্ছেদ্য সত্তা একথাই শেষ পর্যন্ত বলতে চেয়েছেন ব্রাত্য। শিশিরকুমার শুধুমাত্র নাট্যসম্রাট নন। তিনিই ভারতের পেশাদারি থিয়েটারের প্রথম নির্দেশক, এমন একজন থিয়েটার ব্যক্তিত্ব যিনি নিজে কোনও নাটক লেখেননি অথচ অন্যান্য বিভিন্ন নাটককারের নাটককে নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। নাটকের ইতিহাস তাঁর

জীবদ্দশায় তাঁকে ঘিরে প্রশংসার পাশাপাশি সমালোচনা আর ঘৃণা দুইয়ের বাতাবরণই সৃষ্টি করেছিল। সময়-কাল-ইতিহাস আমরা আমাদের মতো করে গড়ি-ভাঙি, তৈরি করি, শিশির ভাদুড়িও তেমনই এক মিথে পরিণত হয়েছেন; তাঁর বেহিসেবী, দেউলিয়া, আধুনিকতা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা বস্তাপচা রোমান্টিক তকমা বা চিরকাল 'হালুমগীর', 'ঘুঘুবীর' করেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়া বিরাট এক নাটককারের ট্রাজিক মিথই আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়। কিন্তু ব্রাত্য বসুর উপন্যাস 'দ্যুতক্রীড়ক' আমাদের সেই খণ্ডিত ইতিহাসকে তুলে ধরে না, বরং নতুন এক শিশিরকুমারের উপর স্পটলাইট ফেলেন ব্রাত্য। আমরা এক ব্যক্তিগত শিশিরকুমারকে আবিষ্কার করি, তাঁর ভুল, ত্রুটি, আক্ষেপ, যন্ত্রণা, ভালবাসা সব ক্ষোভ প্রক্ষোভগুলি নিয়ে। কোনও খণ্ডিত নটসম্রাট ব্রাত্য-র কলমে ধরা পড়েননি। বরং পারিবারিক জীবনে বন্ধুবৎসল, প্রেমিক, আপোসহীন, উচ্চশিক্ষিত, বাঙালি তরুণ জীবনসংগ্রামী তথা নাট্যবিপ্লবী সাংস্কৃতিক যোদ্ধা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছেন শিশিরকুমার। ব্রাত্য বসুর উপন্যাসের বাঁধুনি, তাঁর একাগ্র অভিনিবেশ, আমাদের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে দেখায় শিশিরকুমারের যৌবনে ফেলে আসা উত্তর কলকাতার গলি, সুকিয়াস্ট্রীট, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, ঘোড়ার গাড়ি, হেদুয়ার পুবদিকের জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ আর নিমতলা ঘাট স্ট্রীটের ডাফ কলেজের মিলে গিয়ে স্কটিশচার্চ কলেজ হয়ে ওঠা, হিন্দুস্কুল, ধর্মতলার চৌরঙ্গীর সাহেবি থিয়েটার কোম্পানি, মানিকতলা, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, মার্কাস স্কোয়ার, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের বিখ্যাত লাইব্রেরি, স্টার থিয়েটার, মিনার্ভা, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট আমহার্স্ট স্ট্রিটের ক্রসিং-এ ইভনিং ক্লাব, ঝামাপুকুর লেনের বাড়ি। সবটাই অসামান্য সিনেমাটোগ্রাফির মতোই দক্ষতার সঙ্গে আমাদের সামনে পরপর তুলে ধরেন ব্রাত্য। আসলে তিনিও তো একজন বিখ্যাত নাটককার; কীভাবে নাটকীয় অভিঘাত উপন্যাসের শরীরে ব্যবহার করা যায় তা অনেকটাই জানেন ব্রাত্য। ক্যামেরা রোল করেছে সময় ইতিহাসের সরণী ধরে। অন্য এক সময়, অন্য এক ইতিহাস, অন্য না চেনা যুবক শিশিরকুমার আর তাঁর বন্ধু সুনীতিকুমারের দেখা কলকাতা আর সে সময়ের বুদ্ধিজীবী সমাজ, এক অপূর্ব ইতিহাসকে ধরে রাখতে দেখা যায়। কী আশ্চর্য ভাবে দেখি, ব্রাত্য নাটককার হিসাবে স্বমহিমায় ভাস্বর, কিন্তু এটি তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও অন্য ধারার 'দ্যুতক্রীড়ক' শুধু উপন্যাস হয়েই শেষ হয়ে যায় না। প্রকরণগত নিয়মগুলিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, বুঝিয়ে দিয়েছেন শিশির কনিষ্ঠ নাট্য উত্তরসূরী ব্রাত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের, ভিন্ন ধারার উপন্যাস লিখতে চান; যাতে কল্পনা থাকলেও তার সত্যতা নাটকের মতোই ভীষণভাবে বাস্তব; সময়ের বাস্তব; জীবনের বাস্তব।

উপন্যাসের শুরুতে এক ট্রাজিক ঘটনার উল্লেখ দিয়েই শিশিরকুমারের মতো ট্রাজিক হিরোর কথা শুরু করেছেন ব্রাত্য। স্ত্রী ঊষার আত্মহত্যার ভয়াবহ পরিবেশ বর্ণনার মধ্যে দিয়েই আমাদের সঙ্গে পরিচয় হয় আত্মভোলা যুবক, নাট্যপ্রেমী, উচ্চশিক্ষিত শিশিরকুমারের। আগ্রা শহরের মেয়ে শিক্ষিতা ঊষার সঙ্গে শিশিরের দাম্পত্যে ভালবাসা ছিল না তা বলা যায় না, বরং প্রেমের গভীরতা এতটাই ছিল যে অভিমানেই আত্মহনন করেন ঊষা, শিশিরের রোমান্টিক সত্তার পাশে এক নির্লিপ্ত বিচ্ছিন্নতা ঊষাকে কষ্ট দিত। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে যা অসামান্য ভাষারূপ পেয়েছে; ঊষার মৃত্যু পরবর্তী একটি অংশ উল্লেখ্য —

> 'ঊষার মৃত্যুর পর বিকেলে তাদের যুগীপাড়ার বাড়ির ভাঙা কুয়ো আর লতানো গাছের সামনের মোড়ায় চুপ করে বসে সেইসব দিনগুলো, রাতগুলোর কথাই ভাবছিল শিশির? সেইসব আত্মরতি, মঞ্চের মায়ার মধ্যে দিয়ে আসলে নিজের প্রতি তৈরি হওয়া অবোধ্য এক মায়ার কথা? প্রথম রোমান্স ও দাম্পত্যের ভেতর তৈরি হওয়া সেইসব ছোট ছোট ফাঁক, ছোট ছোট ভুল বোঝা এমনকী হয়তো ছোট ছোট প্রতারণার কথাও? যে প্রতারণা অন্য কোনও নারীকেন্দ্রিক বা তৃতীয় সম্পর্কভিত্তিক হয়ত নয়, শুধু দুটো মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া

সাঁকোভাঙা এক দূরত্ব আর তার জন্য জলের মতো ঘুরে ঘুরে নিজেই গুমরে কাঁদা এবং বিনিময়ে নিষ্ঠুর কোনও উদাসীনতা নাগাড়ে পাওয়া। এইসব উদাসীনতা কি অভিশাপের মতো? নিয়তির মতো? তা কি জীবনে বারবার ফিরে ফিরে আসে? আর সেইসব শাপ আর নিয়তির ক্ষতমুখ থেকেই তৈরি হয় অভিশপ্ত কোনও শিল্পীর অসুখী জীবন? তাই কি সুনীতি তাদের বাড়িতে ঢুকতে শিশির প্রথমেই সুনীতিকে ধরা গলায় বলেছিল, 'এসেছিস? মেয়েদের সম্বন্ধে কখনও উদাসীন হবি না।'[১]

এই উপলব্ধি চিরন্তন ট্রাজিক প্রেমিকের হাহাকারকে এত মার্জিত ভাবে প্রকাশ করেছে যা আমাদের জীবনের মনের চোরাবালির বাঁকের যন্ত্রণাময় আবেগকেই নাড়িয়ে দেয়। এ তো সকলের কথাই হয়ে ওঠে, শুধু শিশিরকুমারের জবানী হয়ে থাকে না। শাশ্বত উপলব্ধির মতো ঘুরে ফিরে আসে এই বোধ। শিল্পীর মনকে এত অনায়াস দক্ষতায় ব্রাত্য এঁকেছেন, যে মাঝে মাঝে মনে হয় এরকমই তো বলতেই হবে নটসম্রাটকে, আসলে শিল্পীরাই জানেন বোঝেন স্রষ্টার যন্ত্রণা। ব্রাত্যর কলম যখন শিশির কুমারের অনুভূতিকে তুলে ধরে; আমরা আন্দাজ করতে পারি নটসম্রাটের অভিশপ্ত জীবনের যন্ত্রণার মাঝেও কারুবাসনার প্রতি এক গভীর থেকে গভীরতর সংযোগ। উপন্যাসের এক জায়গায় বন্ধু সুনীতিকে শিশির বলেছিল —

'আমার জীবনের যাবতীয় ভুল কাজ করার পরে তা এক বিষম অভিশাপ হয়ে বারবার আমার কাছে ফেরত এসেছে। আমি বারবার এক কানা গলির মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। সেখান থেকে কী করে ফেরত যেতে হবে, তা আমি ভাল করে বুঝতেও পারিনি। বদ্ধ এক উন্মাদের মতো লেগেছে নিজেকে তখন। শুধু এক কারুবাসনার অদম্য তাগিদ আমাকে বারবার আবার স্বাভাবিক হৃদয়ে স্বাভাবিক মস্তিষ্কে ফেরত এনেছে। তুই বিশ্বাস কর সুনীতি, আমি আর থিয়েটার করতে চাই না, অভিনয় করতে চাইনা। কারু নির্মাণ করতে চাইনা, কিন্তু আমার কোনও উপায় নেই। আমি ছাড়তে চাইলেও কারুবাসনা আমাকে ছাড়ে না। সে বারবার তার অলৌকিক সঙ্কেত পাঠায় আমাকে। আমিও এক বুনো ক্ষ্যাপার মতো মেতে উঠি। যে জীবনে এসে আজ আমি দাঁড়ালাম, জানিনা আমার ভবিষ্যতে কী আছে। আমি আন্দাজ করতে চাইলেও, তার তল খুঁজে পাবনা জানি। শুধু এটুকু জানি, আমি অভিশপ্ত। এই বাসনা আমার সর্বাঙ্গে তার অভিশাপ লেপে দিয়েছে এর থেকে এ জীবনে আর আমি বেরোতে পারবনা।'[২]

একজন বিপত্নীক পুরুষের এই হৃদয় মুচড়ানো কান্না আর যন্ত্রণার মধ্যেই বোধ হয়, সমগ্রকালের বিরহী মানবের যন্ত্রণা লুকিয়ে থাকে। অতীত শেষ হয় না তা চিরকালের ছবিকেই তুলে ধরে। ব্রাত্যর কলম সেই চিরসত্যকেই, সেই ইতিহাসকেই, ধারণ করে আছে উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে। নোবেলজয়ী আমেরিকান সাহিত্যিক William Faulkner একবার বলেছিলেন "The past is never dead. It's not even past." সত্যিই অতীত কখনই মৃত নয়, এই সত্যই উপন্যাসের গঠনকে এতটাই সুসংবদ্ধ করেছে যে, মাঝে মাঝে শিশির ভাদুড়িকে অতীতের ইতিহাসের নটসম্রাট নয়, এসব কিছু ছাড়িয়ে মনে হয় একজন ট্রাজিক নায়ক; আমাদের চারপাশের জীবনসংগ্রাম, বুদ্ধিজীবী শিল্পীর সংকট বলেই মনে হয়। অথচ এত নিখুঁত ঐতিহাসিক তথ্য খুব কমই কোনও উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায় : ঐতিহাসিক চরিত উপন্যাসে অনেক ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিকের এতখানি দায় থাকে না প্রতিটি নির্ভুল তথ্য উপস্থাপনের। ব্রাত্য এক্ষেত্রে ভীষণ particular, এই ধরনের উপন্যাস আমরা সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা সৃজন বলেই ধরে নেব। প্রকরণগত structure-কে ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন ব্রাত্য বসু। আসলে fiction বলে যা আমাদের চিরাচরিত ধারণা তার থেকে নতুন ভাবেও, তথ্যসূত্র সমেত documentary film-এর মতোও যে বাংলা

উপন্যাস হতে পারে তা বোধ হয় তিনিই শেখালেন। উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে মনে হয়, ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে গেছে। পাঠক পৌঁছে গেছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম, দ্বিতীয় দশকে। ঐতিহাসিক চরিত্ররা ইতিহাসের বই থেকে উঠে এসেছেন সচল, উজ্জ্বল মানবিক রসে সমৃদ্ধ হয়ে। সে যুগের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐতিহাসিক তথ্য বিস্মিত করে। এত নিখুঁত ইতিহাসের বিস্তার কী ভাবে সম্ভব হল উপন্যাস কাঠামোকে বজায় রেখে? শিশির ভাদুড়ির মতন খ্যাতনামা নটসম্রাটের যৌবন, তাঁর বিদ্যাসাগর কলেজে চাকরির সময়কাল, তৎকালীন উত্তর কলকাতা, তার পার্শ্ববর্তী এলাকা, মানুষজন, বৈবাহিক জীবন, মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায় মেদিনীপুরের মামার বাড়িতে কাটানো ছেলেবেলা, রেঙ্গুনে থাকা বাবার প্রসঙ্গ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সারদারঞ্জন রায়চৌধুরী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু, নায়িকা তারাসুন্দরী দেবী, পার্শি ম্যাডানজি যিনি বাংলার চলচ্চিত্র ব্যবসার প্রথম exhibitor প্রথম distributor প্রথম producer, আসলে এগুলি শুধু নাম হিসেবে উপন্যাসে আসেনি শিশিরকুমার ভাদুড়ির আশেপাশে এঁদের প্রত্যেকের উপস্থিতিই তাঁকে নটসম্রাট গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই বাংলা থিয়েটারের যে এক স্বর্ণযুগ ছিল তা থেকে আর এক পর্যায়ের যে পালাবদল তা অসাধারণ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসে —

> ‘কলকাতার যে চালু হলগুলি অর্থাৎ হাতিবাগানে স্টার, বিডনস্ট্রিটের স্টার কিংবা মিনার্ভা বা বীণা থিয়েটার, এগুলিতে বাঙালি নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র চলে যাওয়ার ১০-১২ বছর পর, ক্রমশ সেখানে মন্দা অনুভব করা যাচ্ছে। এখন গিরিশ-অর্ধেন্দু প্রয়াত, বেলবাবু-শিবুবাবু-অমর দত্ত প্রয়াত, অমৃতলাল বৃদ্ধ ও অবসন্ন। নতুন কোন অভিনেতা নেই, যাকে দেখতে থিয়েটারের দর্শকেরা পালে পালে ভিড় জমাবে। দানীবাবু এখনও আছেন কিন্তু তাঁর বয়স হয়েছে। নতুন অভিনেতা ইনটেলেকচ্যুয়াল অপরেশচন্দ্র প্রবলভাবে আছেন, কিন্তু লোক জমানোর সেই স্টার ভ্যালু তাঁর নেই। প্রিয়নাথ ঘোষ, কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, চুনীলাল দেব প্রমুখ অন্যান্য স্বল্পখ্যাত অভিনেতারা সেই সাবেকি প্রাচীন ঘরানাতেই অভিনয় করে যাচ্ছেন। ফলে বাঙালি অভিনেতা ও অভিনয় ক্রমশ অধোগতির দিকে। নতুন নাটককারও প্রায় নেই। মাইকেল-গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রলাল চলে গেছেন। অগতির গতি পণ্ডিত ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ একমাত্র টিম টিম করে জ্বলছেন। ...পুরোনো দর্শকরাও বাংলা রঙ্গমঞ্চ থেকে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছেন। নতুন সময়ের, নতুন কমবয়সী মাঝবয়সী দর্শকরা আসছেন। কিন্তু তাঁদের মনের খোরাক বাংলা রঙ্গমঞ্চে তারা পাচ্ছেনা।’[৩]

ঠিক এই মাহেন্দ্রক্ষণেই যিনি তাঁর মেধা, বৈদগ্ধ, অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা, স্বরক্ষেপণ, এবং সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভূত হলেন তিনিই কিংবদন্তি নটসম্রাট শিশিরকুমার ভাদুড়ি। যিনি নিজে ছিলেন অধ্যাপক; শহরের অভিজাত শিক্ষিত সম্প্রদায় পাবলিক থিয়েটার করবে তা ভাবাই যেত না। সখের নাট্যচর্চায় শিশিরের উৎসাহ স্কুল কলেজ জীবন থেকেই ছিল; কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে থিয়েটার যোগদান সে সময় সমাজনিন্দিত মর্যাদাহীন একটি বিষয় বলেই দেখা হত। সে সময় মহিলা অভিনেতাদের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর একটি বিষয় ছিল, বিজ্ঞাপনে লেখা হত ‘সহকারী বারাঙ্গনা’, এই শব্দবন্ধই শহুরে ভদ্দরলোকেদের আড়ষ্টতা ও গসিপের কারণ ছিল। শিশির ভাদুড়ির কাল এবং সেই কালের প্রতিটি আনাচকানাচের ছোট বড় সবরকমের সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি এত অনায়াস দক্ষতায় ঔপন্যাসিক ব্রাত্য লিখেছেন যে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। ইতিহাসকে এত গভীরে গিয়ে দেখা, এত মূলে গিয়ে অনুসরণ, এতটা বৈদগ্ধ, এতটা তথ্যনিষ্ঠতা, এ সময়ে বিরল। কালের স্বর এত বিস্তৃতি নিয়ে, এত অভিনিবেশ নিয়ে, এত

ভালবাসা আর শ্রদ্ধার সঙ্গে ধরা পড়েছে যে মুগ্ধতা ছাড়া কিছুই বলার থাকে না। উত্তরসূরী নাটককার অভিনেতা ব্রাত্য বসুর কলমে উপন্যাস এগিয়েছে অধ্যাপক শিশিরকুমার থেকে নটসম্রাট শিশিরকুমারের রূপান্তরের অনুপুঙ্খ বর্ণনায়। আশ্চর্য হই অধ্যাপক ব্রাত্য বসুর জীবন একই ভাবে অধ্যাপক, অভিনেতা, নাটককার-এর সরণী ধরে ঔপন্যাসিকের বৃত্তে ধাবিত হয়। তিনিও কাল, ইতিহাস, সমাজ সবকিছুকেই ধারণ করেন একইভাবে। ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়াতে একটি বক্তব্যে William Faulkner বলেছিলেন —

> 'To me, no man is himself, he is the sum of his past. There is no such thing really as was because the past is. It is a part of every man, every woman, and every moment. All of his and her ancestry, background, is all a part of himself and herself at any moment, And so a man, a character in a story at any moment of action is not just himself as he is then, he is all that made him, and the long sentence is an attempt to get his past and possibly his future into the instant in which he does something.'[৪]

একইভাবে এই সত্যটিই ব্রাত্য নিজের অন্তর দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পাঠককেও করিয়েছেন। শিশিরকুমারের উত্থান-পতনময় নাটকীয় ঘটনাবহুল জীবন, কতটা যত্নে ব্রাত্য লিখেছেন তা উপন্যাসটি না পড়লে বোঝানো মুশকিল। অভিনেত্রী প্রভা ও পরবর্তীকালে সহধর্মিণী কঙ্কাবতী নায়ক শিশিরকুমারের ব্যক্তিজীবনের অনেকখানি জুড়ে ছিলেন, ঔপন্যাসিক সেইসব তথ্যও অবিকৃত রেখেছেন তাঁর লেখায়। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৩-এ 'সীতা' নাটকের প্রোডাকশন, জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে তখন ১৯২৪-এ মনমোহন থিয়েটারে খুলেছিলেন সাধের 'নাট্যমন্দির', এরপর নাট্যমন্দির উঠে যায় কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার প্রেক্ষাগৃহে, সময় ১৯২৬, তিনি তখন কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব। ১৯২৯ পর্যন্ত যে খ্যাতি আর সমালোচনা দুইয়ের আবহে শিশিরকুমার আবর্তিত হচ্ছিলেন, তা' হঠাৎ করেই একটা নতুন দিশা পায়। ১৯৩০-এ আমেরিকায় থিয়েটারের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পাড়ি দেন বিদেশ। প্রথম কোনও বাংলা থিয়েটার গ্রুপ বিদেশের মাটিতে পা রেখেছিল সেদিন। প্রশ্ন এটা নয়, তা কতটা মঞ্চ সফল বা আর্থিকভাবে সাফল্য এনেছিল, বরং ভাবতে হবে কোনও পরাধীন দেশের বাঙালি এক সিংহহৃদয় অভিনেতার সাহস আর অসীম মনোবলের কথা, যা ব্রাত্য বসু তাঁর লেখায় বিশেষ ভাবে তুলে ধরতে চান। তিনি Gambler। জীবনের জুয়ায় হেরেছেন বা কখনও জিতেছেন, হয়ত বা আবার হারবেন, তা বলে মাঠ ছাড়েননি। মঞ্চ ছাড়েননি, সৃজনশীলতা থেকে মুখ ফিরিয়ে চলেননি। অর্থ, পুরস্কার, সরকারি সম্মান কোনও কিছুরই ধার ধারেননি নটসম্রাট শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর ঋজু অনমনীয় ব্যক্তিত্ব আর শিরদাঁড়া বাঙালিকে তার গর্বিত ইতিহাসকে স্মরণ করায় তা না মেনে উপায় নেই। ব্রাত্য লিখেছেন —

> 'মধ্যবিত্তের যে মধ্যচিত্ততা থেকে নিজেকে এবং বাংলা থিয়েটারকে আজীবন দূরে রাখতে চাইতেন শিশিরকুমার,'[৫]

কিন্তু ভাগ্য বা নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে কলকাতার বাঙালিদের উপহাস-কলঙ্কই সম্বল করে কপর্দকশূন্য শিশিরকুমার ফিরেছিলেন দেশে। তারপর শ্রীরঙ্গমের নির্দেশনার জীবন আর এক অধ্যায়। উপন্যাসের বিস্তার এ পর্যন্তই। ব্রাত্য বসুর দুর্দমনীয় কলমের জোরে দ্যূতক্রীড়ক শিশিরকুমার এত অপূর্বভাবে জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন আর হারিয়ে দিয়েছেন তাঁর সময়কে। আসলে তো তিনি কালোত্তীর্ণ মানব যিনি ultimately জিতবেনই। ব্রাত্য কী অপূর্বভাবে লিখছেন সে কথা কত সহজে, কিন্তু কত গভীরভাবে।

— 'হ্যাঁ, আমি এইরকম জুয়াড়ী হয়েই বাঁচবো।

আর ক্রমাগত তিন তাস ফেলে যাবো জীবনের মাটিতে। একদিন হয়তো ইস্কাবনের টেক্কা

পাবো, আর একদিন হয়তো পাবো চিড়িতনের দুরি। কিছু আমি ধাওয়া করে যাবো। ঘোড়ার যখন উঠেই পড়েছি তখন শেষদিন পর্যন্ত ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে যাবো। বদনাম, সুনাম, দুর্নাম সব একাকার করে আমি আমার বদ্ধ, দমবন্ধ করা মরা শহরের মরুভূমিতে ওয়েসিস খুঁজে যাবো। আর আমি সেটা পাবোও। একদিন আসবে, তখন সেই ওয়েসিসের ধারে বসে আমি দু'দণ্ড ঠাণ্ডা জল খাবো। আপনি দেখবেন, সেইদিন আসবেই।'[৬]

আর এই অনন্য মানুষটির পরিচয়, শিশিরকুমারের অনুজ বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্র দিয়েছিলেন এভাবে —

'মানুষটি একটি ব্যক্তি নয় — অনেকগুলো ব্যক্তিত্বের একটা জটিল সংমিশ্রণে এই অনন্য মানুষটির সৃষ্টি হয়েছে। ...চারিদিকের এই নিষ্ঠাহীন পেশাদার লোলুপতার মধ্যে তিনিই ছিলেন একটা অনমনীয় লোক যাঁর পা দিয়ে পয়সা ছুঁড়ে ফেলতে কোনো দ্বিধা হতনা।'[৭]

আজকে একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক চরিত উপন্যাস লেখার কী এমন প্রয়োজন? আর যাঁকে নিয়ে লিখলেন সেই প্রায় শতবর্ষ প্রাচীন পেশাদারি থিয়েটার নির্দেশক ও অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়িই বা কেন? আসলে এই সময়ে আমরা আপোষের পথটাকেই নিরাপদ ভেবে নিয়ে ভয় পাই, গুটিয়ে থাকি, সমাজ-সময়-রাষ্ট্র, রাজনীতি সব কিছুকেই সামলে মেরুদণ্ড ধার দিয়ে ফেলি। এই সংকটেই তো শিশিরকুমারকে আমাদের প্রয়োজন। সময়ের থেকে এগিয়ে ছিলেন বলেই হয়ত দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতায় মুসলমান নায়ক ড. আলি কে মুখ্য ভূমিকায় রেখে লেখা নাটক 'পরিচয়' মঞ্চস্থ করতে বুক কাঁপেনি তাঁর। বিধান রায় সরকারের আমলে নির্দ্বিধায় ছুঁড়ে ফেলেছিলেন 'পদ্মভূষণ' সম্মান। সমাজ ও রাজনীতির কোনও চোখ রাঙানিকেই পাত্তা দেননি। আমাদের সে ইতিহাস আর সাহসের আখ্যানই ফিরে দেখাতে চান ব্রাত্য।

সাম্প্রতিক একজন বিখ্যাত আমেরিকান Historian, Diplomat, Novelist Dr. Helena P. Schrader এর Biographical Fiction প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য মনে পড়ছে —

'Biographical fiction is the art of bringing historical figures back to life. It turns a name in the history books into a person so vivid, complex, and yet comprehensible that history itself becomes more understandable. Good biographical fiction provides insight into the psycology of real historical characters and so helps explain the historical events these men and women helped shape by explaining the motives and character traits that drove them to play their role in history.'[৮]

ঔপন্যাসিক ব্রাত্য বসুও ইতিহাসকে এভাবেই ফ্রেমে ধরিয়েছেন অসামান্য ভাবে। হয়ে উঠেছেন বাঙালির অহংকার তাঁর অতুলনীয় লেখনীর মধ্য দিয়ে। 'দ্যূতক্রীড়ক' শুধু উপন্যাস নয়, সময় ইতিহাসের দলিল, নাট্যপ্রেমী বাঙালির আবেগ, ঐতিহ্য আর সাহসের নির্মাণ।

তথ্যসূত্র :

১। আজকাল, শারদ ১৪২৯, দ্যূতক্রীড়ক, পৃ:২৩৪

২। ঐ, পৃ:২৩৫

৩। ঐ, পৃ:২৫২

৪। Rollyson, Carl. Uses of the past in the Novels of William Faulkner, Open Road Integrated Media, Inc, 2016.

৫। আজকাল, শারদ ১৪২৯, দ্যুতক্রীড়ক পৃ:৩৩৫

৬। ঐ, পৃ:৩৬০

৭। 'শিশিরকুমার' প্রবন্ধ শম্ভু মিত্র, পৃ:২৮-৩১

৮। 'Resurrecting the dead : Or the delicate art of writing biographical fiction', The History Press, By Helena P. Schrader.

সৌমি দাশ : প্রাবন্ধিক এবং সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়।